কীভাবে বাড়াবেন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা

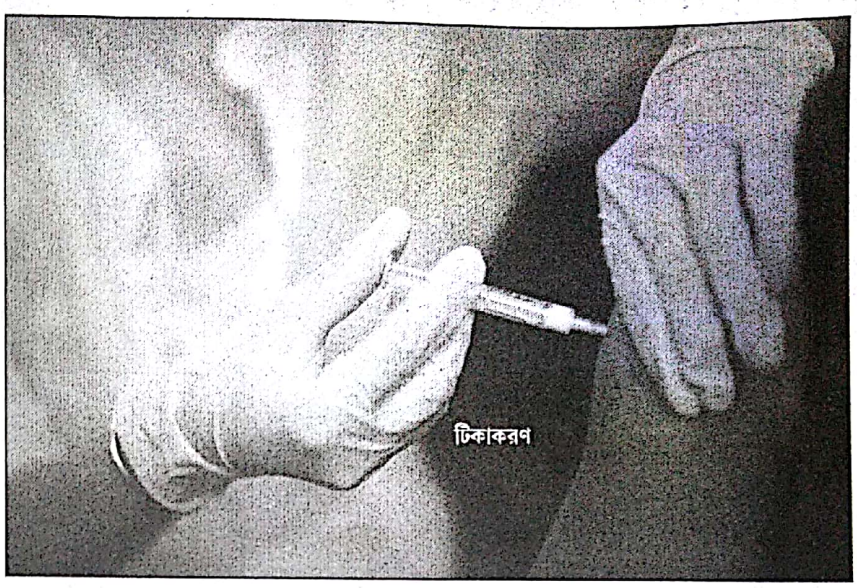
টিকাকরণ

ডাঃ কুণাল ভট্টাচার্য

(প্রাক্তন অধ্যক্ষ, নেপাল হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ)

ফোন : ৯৮৩১৪২১৬৯৬

মনুষ্য প্রজাতি গুহামানব থেকে বর্তমান সময়ের উন্নত মানুষ হওয়ার পরে কোটি কোটি বছর ধরে বহু রোগজীবাণুর আক্রমণের শিকার হয়েছে এবং কোনো অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক ডাক্তার ছাড়াই অনেক ক্ষেত্রে তা নিজে নিজেই সামলে নিয়েছে। আমরা দেখি বহু মানুষ একসঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজল, কিন্তু জ্বর হল অল্প কয়েকজনের। অনুষ্ঠান বাড়িতে গুরুপাক খাবার সবাই খেলেও অসুস্থ হয় মাত্র কয়েকজন। মানুষ বিভিন্ন রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে এই লড়াই করতে পারে যে প্রকৃতিদত্ত অন্তর্নিহিত শক্তির মাধ্যমে তার নাম ইমিউনিটি অর্থাৎ অনাক্রম্যতা। যাদের ইমিউনিটি কম, তারা অসুস্থ হয় বেশি। আবার ইমিউনিটি অত্যধিক বেশি হলেও বিপদ। তাই শরীরের ইমিউনিটি সর্বদা একটা সাম্যাবস্থায় থাকা প্রয়োজন—বেশিও না, কমও না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় এই সাম্যাবস্থাকে বলে হোমিওস্টেসিস। সাধারণভাবে এই হোমিওস্টেসিস কিন্তু কোনো যন্ত্রপাতি বা ওষুধের মাধ্যমে রক্ষা করতে হয় না। মানবশরীরে এই স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু কোনো কারণে শরীর নিজের থেকে এই সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে না পারলে বাইরের সাহায্য প্রয়োজন হয়। একে বলা হয় ইমিউনোমডিউলেশন।

কীভাবে শরীর রোগ প্রতিরোধ করে

শরীরের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দু' ভাবে কাজ করে—বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ।

বাহ্যিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা

বাহ্যিক আবরণ : কোনো রোগজীবাণু শরীরে প্রবেশ করতে চাইলে আমাদের শরীরের বাইরের আবরণ অর্থাৎ ত্বক, চুল এবং মিউকাস মেমব্রেন প্রথম বাহ্যিক প্রতিরোধের কাজ করে।

রাসায়নিক : আমাদের চামড়া থেকে ফ্যাটি অ্যাসিড, ল্যাকটিক অ্যাসিড, ফসফোলিপিড, ইমিউনোগ্লোবিউলিন ইত্যাদি রাসায়নিক নিঃসৃত হয়। এই রাসায়নিকগুলোও রোগজীবাণু ধ্বংসে সাহায্য করে।

অ্যালোপ্যাথিক মলম চামড়ার রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুকে সাময়িকভাবে মেরে ফেললেও চামড়ার এই স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধকারী রাসায়নিকগুলোর ক্ষরণ কমিয়ে দেয়। তখন চামড়ার রোগ সাময়িকভাবে চলে গেলেও ত্বকের প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যাওয়ায় সেই রোগ বারবার ফিরে আসে। বডি লোশন, ক্রিম, পারফিউম ইত্যাদি কসমেটিক্স ব্যবহার করলেও একই ঘটনা ঘটে। বর্তমানে দাদ জাতীয় চামড়ার রোগের প্রাদুর্ভাবের পিছনে এই কারণটিকে গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে।

আভ্যন্তরীণ রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

• **মিউকাস মেমব্রেন :** বাইরে ত্বকের মতো শরীরের ভিতরের মিউকাস মেমব্রেন ও সেখান থেকে নিঃসৃত বিভিন্ন রাসায়নিক, লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালা, পাকস্থলির হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, রেনিন, পেপলিন সহ অন্যান্য পাচকরস রোগজীবাণু প্রতিরোধে সাহায্য করে। এছাড়াও মিউকাস মেমব্রেনের সিলিয়া কোষের সংস্পর্শে কোনো বহিরাগত উত্তেজক পদার্থ এলে সেই কোষের প্রতিবর্তী ক্রিয়ায় হাঁচি-কাশির উদ্রেক হয়ে উত্তেজক পদার্থটিকে দেহের বাইরে বার করে দেয়।

• **ক্ষরণ :** মল, মূত্র ও ঘামের মাধ্যমে আমাদের বিপাকীয় বর্জ্য পদার্থগুলি শরীর থেকে বার হয়ে যায়। তাই ওষুধ খাওয়ার পর যদি শরীরের এইসব স্বাভাবিক ক্ষরণ বৃদ্ধি পায় ও শরীর সুস্থ বোধ করে, তবে তা ভালো লক্ষণ।

• **ব্যাক্টেরিয়া :** আমাদের শরীরের মধ্যে ল্যাক্টোব্যাসিলাস, ই-কোলাই ইত্যাদি কিছু ভালো ব্যাক্টেরিয়া বাস করে। বাইরের কোনো ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়া শরীরে প্রবেশ করলে এগুলি ওই জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়ে শরীরকে রক্ষা করে। অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ এই ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়ার

Scanned by CamScanner

সঙ্গে ভালো ব্যাক্টেরিয়াগুলোকেও ধ্বংস করে ইমিউনিটির ক্ষতি করে।

● **অ্যাকিউট ফেজ রেসপন্স :** হঠাৎ কোনো ইনফেকশন বা ইনজুরি হলে কোষগুলিকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য শরীর যে ব্যবস্থা নেয় তাকে অ্যাকিউট ফেজ রেসপন্স বলে। জ্বর এক ধরনের অ্যাকিউট ফেজ রেসপন্স। বিভিন্ন অ্যাকিউট ফেজ রেসপন্স প্রোটিন, যেমন— সি.আর.পি, প্রোটিওলাইটিক এনজাইম ইনহিবিটর, ফিব্রিনোজেন ইত্যাদি এই কাজে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ হঠাৎ কোনো ইনফেকশন হলে সি.আর.পি-র মাত্রা বহুগুণ বেড়ে গিয়ে ব্যাক্টেরিয়ার ফসফোলিপিডের গায়ে আটকে যায় ও ব্যাক্টেরিয়ার টক্সিনকে প্রশমিত করে। ফিব্রিনোজেন বেড়ে গিয়ে ই.এস.আর বাড়িয়ে দেয়। চিকিৎসায় রোগ কমে এলে সি.আর.পি, ই.এস.আর-এর মাত্রাও কমে আসে।

● **সাইটোকাইনস্ :** এগুলি এক ধরনের প্লাজমা প্রোটিন এবং ইমিউনিটির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইন্টারলিউকিন, টিউমার নেক্রোসিস ফ্যাক্টর হল কিছু উল্লেখযোগ্য সাইটোকাইনস্। কোনো ইনফেকশন হলে ইন্টারলিউকিন-১ ইমিউন কমপ্লেক্সের ওপর ক্রিয়া করে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন নিঃসরণ করে। প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন হাইপোথ্যালামাসকে উত্তেজিত করে শরীরের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। টিউমার নেক্রোসিস ফ্যাক্টর ক্যাটাবলিজম বাড়িয়ে দেয়। ফলে ওজন হ্রাস পায়। সুতরাং ক্যানসার চিকিৎসার যদি ওজন বৃদ্ধি পায়, তাহলে বুঝতে হবে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরছে এবং ওষুধে কাজ দিচ্ছে।

● **রক্ত :** ইমিউনিটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শ্বেতকণিকার টি ও বি লিম্ফোসাইট এই কাজে সাহায্য করে। কোনো জীবাণু শরীরে প্রবেশ করলে টি লিম্ফোসাইট ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে সেই জীবাণুকে গিলে নেয় (একে বলে সেলুলার ইমিউনিটি)। বি লিম্ফোসাইটের প্লাজমা সেল থেকে IgA, IgG, IgM, IgE, IgD প্রভৃতি ইমিউনোগ্লোবিউলিন নিঃসৃত (অ্যান্টিবডি) হয়। এগুলি ব্যাক্টেরিয়াল টক্সিনকে প্রতিহত করতে সাহায্য করে। একে বলা হয় হিউমোরাল ইমিউনিটি। এই দুই প্রকার ইমিউনিটির মাধ্যমে আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ করে।

কখনও কখনও কোনো অজানা কারণে বা কোনো সংক্রমণের পর এই বি লিম্ফোসাইটের

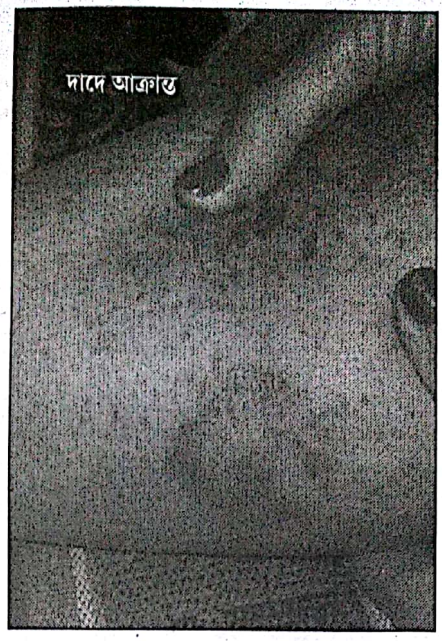

“শরীরের ভিতরের মিউকাস মেমব্রেন ও সেখান থেকে নিঃসৃত বিভিন্ন রাসায়নিক, লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালা, পাকস্থলির হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, রেনিন, পেপলিন সহ অন্যান্য পাচকরস রোগজীবাণু প্রতিরোধে সাহায্য করে।”

অ্যান্টিবডিগুলি শত্রু ভেবে আক্রমণ করে। এই অবস্থাকে বলে হাইপারসেনসিটিভিটি বা অটোইমিউন রিঅ্যাকশন। অ্যালার্জি, হাঁপানি, রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস প্রভৃতি বহু রোগ এই অটোইমিউন প্রকৃতির।

শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা কীভাবে ব্যাহত হয়

মানুষের ইমিউনিটির অন্যতম প্রধান উপাদান হল প্রোটিন। বাইরে থেকে কোনো অবাঞ্ছিত প্রোটিন শরীরে প্রবেশ করলে বা শরীরের আভ্যন্তরীণ গোলযোগে প্রোটিনের সাম্যাবস্থা ব্যাহত হলে ইমিউনিটিতেও তার প্রভাব পড়ে। যেসব কারণে প্রোটিনের সাম্যাবস্থা ব্যাহত হয় সেগুলো হল—

■ ক্রোধ, দুঃখ, অবসাদ ইত্যাদি মানসিক সমস্যায় সেরোটোনিন, অ্যাড্রেনালিন ইত্যাদি নিউরোট্রান্সমিটার ও হরমোনাল প্রোটিনের অত্যধিক ক্ষরণের জন্য।

■ ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়ার টক্সিনজাতীয় বহিরাগত প্রোটিন প্রবেশের জন্য।

■ কীটপতঙ্গের কামড়ের টক্সিন প্রবেশের জন্য।

■ অ্যান্টিবায়োটিক ও কৃমিনাশক ওষুধে মৃত জীবাণুর দেহ ভেঙে গিয়ে শরীরে অবাঞ্ছিত প্রোটিন সৃষ্টির জন্য।

■ টিকাকরণ বা ভ্যাকসিনের মাধ্যমে শরীরে বহিরাগত প্রোটিন প্রবেশের জন্য।

■ স্টেরয়েড, কনট্রাসেপটিভ পিল ইত্যাদি হরমোনাল প্রোটিন ব্যবহারের জন্য।

কীভাবে শরীরের ইমিউনিটি বাড়ানো যায়

শরীরে ইমিউনিটি দু' ভাবে বাড়তে পারে— এক, প্রকৃতিগত ও দুই কৃত্রিমভাবে অর্থাৎ ওষুধের মাধ্যমে।

অনেক সময় দেখা যায় কোনো রোগ হলে রোগীর শরীরে সেই জীবাণুর বিরুদ্ধে যে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, সেই অ্যান্টিবডিই পরবর্তীকালে সেই রোগের আক্রমণ প্রতিহত করে। যেমন কারোর পক্স হলে ভবিষ্যতে আর পক্স হয় না। আবার বাচ্চারা মাতৃগর্ভে থাকাকালীন নাড়ির মাধ্যমে এবং জন্মের পর মায়ের দুধের মাধ্যমে মায়ের ইমিউনোগ্লোবিউলিন সরাসরি পেয়ে থাকে যা তাদের রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। এগুলো প্রাকৃতিক ইমিউনিটি বাড়ার উদাহরণ।

প্রচলিত অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় এখনো অবধি দু' ভাবে কৃত্রিম উপায়ে ইমিউনিটি বাড়ানো যায়—

■ **ইমিউনোগ্লোবিউলিন :** টিটেনাস, রেবিস প্রভৃতি কিছু কিছু রোগ প্রতিরোধে সেই রোগের প্রতিষেধক ইমিউনোগ্লোবিউলিন (সাধারণত ঘোড়ার রক্তে পাওয়া যায়) শরীরে প্রবেশ করিয়ে। তবে এর কার্যকাল খুবই কম—কয়েকদিন মাত্র।

Scanned by CamScanner

■ **ভ্যাকসিন :** এর মাধ্যমে অর্ধমৃত বা মৃত জীবাণু শরীরে অ্যান্টিজেন হিসাবে প্রবেশ করানো হয়। কার্যকারিতা কম থাকায় সেই জীবাণু রোগ সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু শরীরে সেই রোগের প্রতিরোধী অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে যায়। ফলে ভবিষ্যতে সেই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। কিন্তু মুশকিল হল একটি ভ্যাকসিন একটিমাত্র রোগকেই প্রতিরোধ করতে পারে। যত রোগ, তত ভ্যাকসিন। সব ভ্যাকসিন সমান কার্যকরীও নয়। যেসব জীবাণু মিউটেশনের মাধ্যমে ক্রমাগত তাদের চরিত্র বদল করে (যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা, চিকেন পক্স ইত্যাদি) তাদের ভ্যাকসিন ততটা সফল নয়। অনেক গবেষকের মতে এম.এম.আর ও ডি.পি.টি ভ্যাকসিনের প্রতিক্রিয়ায় অটিজম, হাইপারঅ্যাক্টিভিটির মতো রোগের সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। তাঁরা আরও বলছেন, ভ্যাকসিন দিলে সেই রোগের প্রতিরোধী IgG বৃদ্ধি পায়। কিন্তু শরীর সবসময় মোট ইমিউনোগ্লোবিউলিনের পরিমাণ সাম্যাবস্থায় অর্থাৎ ১০০% রাখার চেষ্টা করে। তাই IgG বাড়লে সাম্যাবস্থা বজায় রাখার জন্য IgA-এর পরিমাণ কমে যায়। এই IgA চামড়া, শ্বাসনালী, খাদ্যনালী, যোনিদ্বারের মিউকাস ইত্যাদি স্থানে বেশি থাকে। তাই অতিরিক্ত ভ্যাকসিন দিলে ভবিষ্যতে বিভিন্ন চর্মরোগ, অ্যালার্জি, হাঁপানি ইত্যাদি রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ভ্যাকসিন কোম্পানিগুলির প্রবল দাপটে এইসব গবেষণার তথ্য চেপে রাখা হলেও আমরা চেষ্বারে প্রতিনিয়ত এর প্রমাণ পাচ্ছি।

ইমিউনিটির সঠিক বৃদ্ধি সম্ভব হোমিওপ্যাথিক ওষুধে

তাহলে দেখা যাচ্ছে ওষুধের মাধ্যমে রোগবিশেষে ইমিউনিটি বাড়ানো গেলেও সামগ্রিকভাবে ইমিউনিটি তথা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো এখনও সম্ভব হয়নি। এই অবস্থায় সেখানে অ্যালার্জি, হাঁপানি, রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস জাতীয় অটোইমিউন রোগগুলোতে আধুনিক অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা নিরাময়ের প্রশ্নে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ। সেখানে চিকিৎসা-রাজনীতির জাঁতাকলে পিষ্ট হোমিওপ্যাথিক ওষুধ হাজার হাজার রোগীকে কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই ভালো করে তুলছে। হোমিওপ্যাথিক ওষুধ একটা বিশেষ নীতির ওপর ভিত্তি করে কাজ করে—"Like Cures Like" অর্থাৎ সদৃশ ওষুধ দ্বারা সদৃশ রোগকে নিরাময়। ভ্যাকসিনও কিন্তু

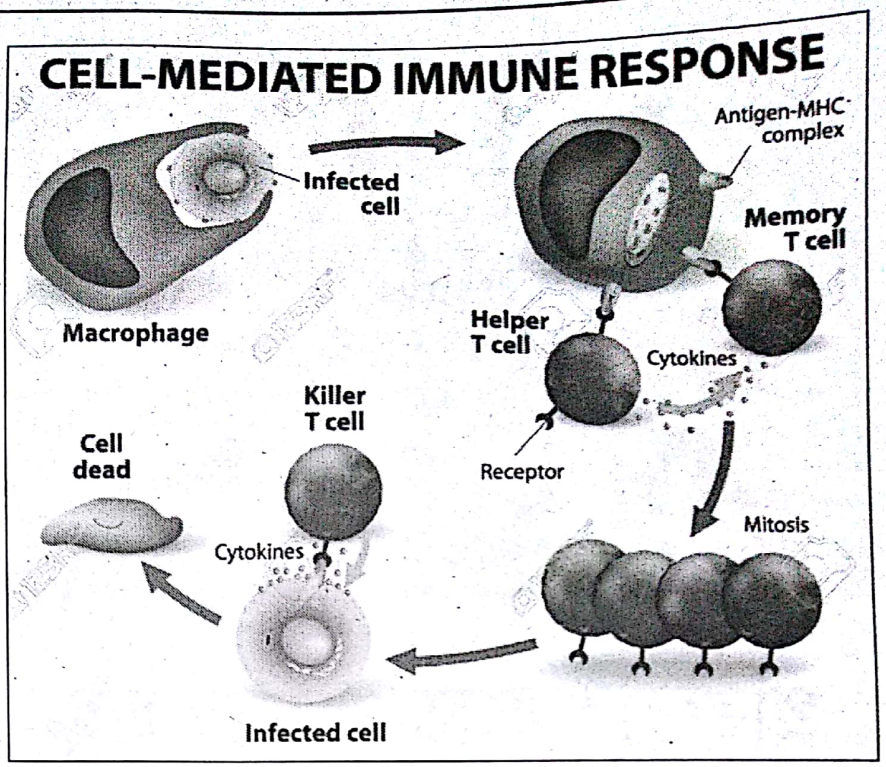

> অর্ধমৃত বা মৃত জীবাণু শরীরে অ্যান্টিজেন হিসাবে প্রবেশ করানো হয়। কার্যকারিতা কম থাকায় সেই জীবাণু রোগ সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু শরীরে সেই রোগের প্রতিরোধী অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে যায়। ফলে ভবিষ্যতে সেই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।

একই নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ভ্যাকসিনে যে রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে, সেই রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিয়ে রোগ প্রতিরোধী অ্যান্টিবডি তৈরি করা হয়। অপরদিকে হোমিওপ্যাথিতে রোগের জীবাণু নয়, বরং যে রোগীকে নিরাময় করতে হবে সেই রোগীর রোগলক্ষণ সহ অন্যান্য ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলি (যেমন খিদে, ঘুম, স্বপ্ন, ভয়-ভীতি, ক্রোধ, মানসিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি) যে ওষুধ সুস্থ মানুষের শরীরে তৈরি করতে সক্ষম (অর্থাৎ রোগের সদৃশ লক্ষণ), সেই ওষুধ অত্যন্ত স্বল্পমাত্রায় প্রয়োগ করা হয়। রোগীর সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য নেওয়া হয় বলে এতে রোগীর শরীরেও একটা সামগ্রিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়। সূক্ষ্ম মাত্রায় দেওয়া হয় বলে ভ্যাকসিনের কুফলগুলোও এতে দেখা যায় না।

শেষ কথা

বাচ্চাকে সুস্থ রাখতে কোন বাবা মা না চান? কিন্তু সেই সুযোগ নিয়ে ভ্যাকসিন কোম্পানিগুলো নিত্যনতুন ভ্যাকসিন তৈরি করছে এবং কার্যকারিতায় প্রশ্নচিহ্ন থাকলেও প্রাইভেট প্র্যাকটিশনারদের মাধ্যমে বাবা মাকে রোগের ভয় দেখিয়ে ব্যবসার জন্য সেগুলোকে শিশুদের ওপর নির্বিচারে প্রয়োগ করে চলেছে। ফলে বেড়ে চলেছে অ-নিরাময়যোগ্য অসুখের পরিমাণও। তাই আমরা বলি সরকারি তালিকার বাইরে কোনও ভ্যাকসিন দেবেন না। নিশ্চিন্তে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার আশ্রয় নিন। এতে বাড়বে আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, সুস্থ থাকবেন আপনি, সুস্থ থাকবে আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। ❑

Scanned by CamScanner